

প্রথম আলো

অনলাইন সংস্করণ

ঢাকা, বুধবার, ১১ অক্টোবর ২০০৬, ২৬ আশ্বিন ১৪১৩, ১৭ রমজান ১৪২৭
বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩৩১, আপডেট : বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৫৫ মিনিট

সরকারের ৫ বছর কেমন কাটল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশের ভোটারদের বড় একটা অংশ দুই পক্ষের সমর্থক-কেউ বিএনপি, কেউ আওয়ামী লীগের। কিন্তু এই সমর্থকদের ভেতর আনুগত্যের ব্যাপারে গভীরতার পার্থক্য রয়েছে, কারও সমর্থন শক্ত, কারওটা ঢিলে। আর রয়েছেন অনেক মানুষ, যারা কোনো দলের প্রতিই অনুরক্ত নন, কেউ কেউ বরং উভয় দলের প্রতিই বিরক্ত। এই যে যারা কম অনুরাগী এবং বিরক্ত, নির্বাচনের ফলাফল সুভাবতই এদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। গতবারও তা-ই হয়েছে। বিএনপি জোট বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে, তা আমরা জানি এবং তার যে প্রতিফল তা-ও অধিকাংশ মানুষই হাড়ে-হাড়ে অনুভব করতে বাধ্য হয়েছেন। বিএনপির ভেতর যারা চিন্তাপ্রবণ, তাদের কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেছে, বিজয়ের মাত্রাটা কিছুটা খাটো হলে ভালোই হতো, তাতে সরকারের দায়িত্ববোধ বাড়ত। গত নির্বাচনে ভোটারেরা আসলে বিএনপির পক্ষে যতটা না ভোট দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি দিয়েছেন তখনকার সরকারের বিপক্ষে। আওয়ামী শাসনের শেষ দিনগুলোয় সন্ত্রাসের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল; মানুষ তাই পরিবর্তন চেয়েছেন এবং আশা করেছেন, সরকার বদলালে নিরাপত্তা বাড়বে। বেড়েছে কি? হ্যাঁ, র্যাবের তৎপরতার দরুন চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অনেকেই গা-ঢাকা দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ, দুর্নীতি এসব যে কমেছে, তা বলা যাবে না। তা ছাড়া শরীরে নিজের ভেতরও ভূত ঢুকেছে বলে টের পাওয়া গেছে, র্যাবের কিছু কাজ সরাসরি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হয়েছে। তদুপরি বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার যে প্রতিশ্রুতি বিএনপি দিয়েছিল পাঁচ বছর ধরে তা নিয়ে বিস্তর ছলাকলা দেখা গেল কিন্তু পৃথককরণ ঘটল না। ভোটারদের ধারণা ছিল, তারা বিএনপিকে জয়যুক্ত করেছেন। অচিরেই প্রকাশ পেল যে বিএনপি নয়, ক্ষমতায় এসেছে একটি জোট, যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী, যারা ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। পাঁচ বছর ধরে জামায়াত ওই কাজ মহোৎসাহে করেছে। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে নিজেদের লোক নিয়োগ করেছে; ব্যাংক, ব্যবসা, নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। বিএনপির সঙ্গে না থাকলে তাদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হতো, কিন্তু জোটে থেকে তারা কেবল যে ধর্মকে ব্যবহার করেছে তা নয়, বিএনপিকেও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

গত পাঁচ বছরে তথাকথিত ইসলামি জঙ্গিদের তৎপরতাও ভয়ঙ্কর বৃদ্ধির পেছনে জামায়াতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন যে কার্যকর ছিল সে বিষয়ে কারও মনেই কোনো সন্দেহ নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত হবেন-এ ছিল অকল্পনীয়, তা ঘটেছে। বোমা ফেটেছে অসংখ্য। নিহত হয়েছেন বিচারকেরা। কিন্তু জঙ্গি দমনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি যারা দণ্ড পেয়েছে তাদের দণ্ড কার্যকর হয়নি। ধর্মব্যবসায়ীদের সম্ভ্রষ্ট রাখার জন্য মাদ্রাসাশিক্ষার প্রসার ঘটানো, সাধারণ শিক্ষাকে মাদ্রাসাশিক্ষার কাছাকাছি টেনে নামানোর চেষ্টা, মাদ্রাসার দেওয়া সনদকে সাধারণ শিক্ষা সনদের সমান মর্যাদা দেওয়া-এসব ক্ষতিকর কাণ্ড নির্বিঘ্নে ঘটেছে।

রাজনৈতিকভাবে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করার কাজে বিদায়ী সরকার তার আগের সরকারের চেয়ে কম উৎসাহ দেখায়নি, বরং তাদের ছাড়িয়েই গেছে। আগামী সরকার এই ধারাকে যদি আরও অগ্রসর করে নেয় তবে সেটা হবে ভয়ঙ্কর, তাতে পুলিশি দৌরাভ্য ও দুর্নীতি আরও দুঃসহ হয়ে উঠবে। আইন-শৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা এমনিতেই খুব কম, সেটা আরও নেমে গেলে দেশে কোন ধরনের অরাজকতা দেখা দেবে, কে জানে। গত পাঁচ বছরে তা যে নেমেছে সেটা তো পরিষ্কার। যে দুটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়ের দিকে সরকার গত পাঁচ বছরে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি তার একটি হলো বিদ্যুৎ, অপরটি দ্রব্যমূল্য। বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তা কী করে মেটানো যাবে, তা নিয়ে সরকারের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল বলে মনে হয় না। চেষ্টা যেটুকু নেওয়া হয়েছিল তা-ও মুখ খুবড়ে পড়ে গেছে দুর্নীতির দাপটে। এদিকে জিনিসপত্রের দাম যে ক্রমাগত বাড়ছে সরকার সেটা মানতেই চায়নি। যখন দেখল মানুষ ক্ষেপে উঠেছে তখন পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা নিয়েছে বলে শোনা যায়, কিন্তু কোনো চেষ্টাই কার্যকর হয়নি; কারণ দাম যারা বাড়িয়েছে এবং বাড়াচ্ছে তারা সরকারেরই আপনজন।

কিন্তু এক হাতে তো তালি বাজে না, অন্য একটি হাতও ছিল। সেটা বিরোধী দল। তারা জনগণের সমস্যাগুলো নিয়ে আন্দোলন করতে পারেনি। একেবারে শুরু থেকেই তাদের মূল কথাটা ছিল, জোট সরকারকে টেনে নামাবে। বলাবাহুল্য জনগণ তাতে সাড়া দেয়নি। আশ্বস্তও হয়নি। বিরোধী দলের কাছে প্রত্যাশা ছিল সরকারের ত্রুটিগুলোর উল্লেচন এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি, সরকার যাতে সংযত হয়। সে কাজটা সংসদে করা যেত, করা যেত রাজপথেও। তা না করে বিরোধী দল হরতাল, অবরোধ ইত্যাদির ডাক দিয়েছে, যেসব কাজ সরকারকে তার দুঃশাসন থেকে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে তেমন কোনো ভূমিকাই রাখেনি। এর ফলে মানুষ সরকারের ওপর বিরূপ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু বিরোধী দলের প্রতি তাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলা যাচ্ছে না।

বাধ্য হয়ে জনগণ নিজেরাই আন্দোলনে নেমেছেন। বিদ্যুৎ, পানি, তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি-এসব দাবি নিয়ে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। সরকারি দল নিপীড়ন করেছে, বিরোধী দল সাড়া দেয়নি। ফুলবাড়ীতে উল্লুঙ খনি তৈরির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের যে আন্দোলন, তাতে বিরোধী দলের কোনো প্রকার অংশগ্রহণ ছিল না। বস্তুত তেল, গ্যাস, বন্দর, খনিজসম্পদ ইত্যাদি বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে বিদায়ী সরকারের উৎসাহ ও তৎপরতার কমতি ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে আগের সরকারগুলো যে কম আগ্রহী ছিল, তা নয়। বিরাষ্ট্রীকরণে সব সরকারই সমান সচেষ্ট। গত পাঁচ বছরে এটা তাই আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজনৈতিক দলের কোনোটিই জনগণের স্বার্থ দেখে না, তাদের লড়াইটা ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারার। তারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত, যেটি শাসক শ্রেণী; যার চরিত্র জনবিরোধী। আগামী নির্বাচনেও এদের মধ্যেই লড়াইটা বাধবে। মানুষ ভোট দেবেন। কারণ নির্বাচন এক ধরনের উৎসব এবং দেশে উৎসবের খুব অভাব। দ্বিতীয়ত, অনেককেই ভোট দিতে বাধ্য করা হবে। তৃতীয়ত, এই দুই দলের বাইরে তো এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তি এখনো বিকশিত হয়নি, যাদের মানুষ তাদের পক্ষের শক্তি বলে মনে করতে পারেন। তারা ভোট দেবেন এবং ফলাফল প্রকাশের মুহূর্তটি থেকেই বুঝতে শুরু করবেন কাকে ভোট দিয়েছেন। তখন নীরবে কপাল চাপড়ানো শুরু হবে। গত সরকার নানা রকমের অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন, আগামী সরকারও শোনাবেন। এবং জনগণের মনে হবে পাঁচ বছর বড় দীর্ঘ সময়, সরকারের জনবিরোধী তৎপরতার মেয়াদকাল কোনোমতেই চার বছরের অধিক হওয়া উচিত নয়।